চর্যাপদে বর্ণিত নিসর্গ চিত্র ॥

১৮/২০

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হ'ল চর্যাপদ। বৌদ্ধ-সহজিয়ারা কায়া সাধনার উদ্দেশ্যে চর্যাপদ রচনা করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই মায়া-মোহময় জগৎ থেকে চিত্তকে বিমুক্ত রাখতে পারলে, গুরুর নির্দেশে মহাসুখ লাভ করা যাবে। কিন্তু চর্যাপদ সাধন সঙ্গীত হলেও পরমার্থ্য পদকর্তাদের চেতনে বা অবচেতনে নিসর্গ প্রকৃতির নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। কারণ তাঁরা, তাঁদের চোখে দেখা চারিপাশের প্রকৃতি জগৎকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এছাড়াও সমাজ পরিবেশের প্রভাবতো প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয়। আমরা এখন প্রসঙ্গে দেখব চর্যাপদে এই নিসর্গ চিত্র কতখানি প্রকাশ পেয়েছে।

চর্যাপদের অন্যতম প্রধান পদকার হলেন-শবরপাদ। তাঁর 'উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী,' পদটিতে দেখি নিসর্গ প্রকৃতির রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। উঁচু উঁচু পর্বত যেখানে শবরী বালিকা বাস করে- এই বর্ণনার সূত্রে পার্বত্য অঞ্চলের বর্ণনা কবি দিয়েছেন। কারণ নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'ল ভূ-প্রকৃতি। তার কবিরা কেবলমাত্র ভূ-প্রকৃতির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি- তাই দেখি কবি শবরপাদ নানা বৃক্ষের গাছের মুকুলিত হওয়ার কথা বলেছেন। যেগাছগুলির আকৃতি সম্বন্ধে বলেছেন- গাছগুলির ডাল এত দীর্ঘ যেন, সেগুলি আকাশ স্পর্শ করেছে। তাই এখানে দেখি শবরপাদ নিষ্ঠার সঙ্গে বস্তুচিত্রকে তুলে ধরে বলেছেন— "নানা তরুবর মৌলিলরে গঅনত লাগেলী ডালী।" আর তখন সহজেই অনুভব করা যায় কবি কেবলমাত্র উঁচু উঁচু পর্বতের কথা বলেননি, এই ভূমি যে পুষ্পে, পত্রে, স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশোভিত সেই কথাও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয় উঁচু পর্বত যেমন আছে, তেমনি আছে গিরি-শিখরের সন্ধি- এই বর্ণনা দিতেও তিনি ভুল করেন নি। পদটিতে এই সুন্দর সুশোভিত প্রকৃতির কথা বলে কবি, সাংকেত সাধনার কথা বলেছেন এইগুলি থেকে দূরে থাকতে। আর সেই সূত্রেই এই নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র সুন্দর ভাবে তাঁর পদে স্থান পেয়েছে।

শুধুমাত্র উঁচু পর্বতের কথা নয় এদেশের নানা নদ-নদীর প্রসঙ্গ এসেছে তাঁদের পদে। ডোম্বীপাদের- "গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে

"বহই নাইক" পদটিতে কবি গঙ্গা-যমুনা নদীর কথা এনেছেন। আর সেই সূত্রে পঞ্চকেয়ালের নৌকা চালনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে পদটিতে। শুধুমাত্র নাবিকের নৌকা চালনার বর্ণনা নয় কবি নিখুঁত ভাবে সেঁউতী দিয়ে নৌকার জল সেঁচে ফেলে প্রকৃতির মাঝে ~~সূক্ষ্ম চিত্রের~~ সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কিত করেছেন। কবি ডোম্বী পাদ কেবলমাত্র প্রকৃতি জগতের কথা বলতে গিয়ে ভূপৃষ্ঠেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি। তিনি বলেছেন- "চন্দ সূজ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিন্দা," অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য দুই চক্র পুলিন্দ সৃষ্টি ও সংহার করছেন। প্রকৃতি জগতের ধারক-বাহক- প্রাণ শক্তির উৎস সূর্যদেব কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় না। তাই এখানেও দেখি ডোম্বী পাদ তাঁর পদটিতে নিসর্গ প্রকৃতির চিত্রকে সফলতা দান করেছেন।

ভুসুকু পাদ তাঁর 'নিসি অন্ধারী মুসঅ চার' পদটিতে নিসর্গ প্রকৃতির চিত্রকে অঙ্কিত করতে গিয়ে অন্ধকার রাত্রিতে ইঁদুরের চরে বেড়ানোর কথা বলেছেন। তবে চর্যাপদে নদ-নদীর ~~প্রকৃতি~~ প্রসঙ্গবার বারংবার এসেছে। চাটিল পাদের "ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী" পদটিতে ~~[illegible]~~ নদী রূপে কল্পনা করেছেন আর সেই নদীর দুই তীরে কেমন থাকে আর গম্ভীর নদীর মাঝখানে যেমন থৈ তল পাওয়া যায় না, সেকথাও বলেছেন। তাই চাটিল পাদ নিসর্গ প্রকৃতির এই বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- "দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।" নিসর্গ প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি এই নদীর বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে সাঁকো দিয়ে নদী পার হওয়ার কথা বলেছেন, যা নিসর্গ প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে আছে। এই নদীর বর্ণনার কথা পাই কম্বলাম্বর পাদের পদে যেখানে তিনি নদীর কথা কেবল মাত্র বলেই থামেননি, তিনি এর ঢেউ ও স্রোতের প্রসঙ্গকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ("সোঁম বেনী তরঙ্গম মুনিআ।")

চর্যাপদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কাহ্ন পাদ তাঁর নিসর্গের এক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপ রূপ ও পদ্মফুলের সৌন্দর্য, যখন তিনি বলেন- "এক সো পদুমা চৌষঠী পাখুড়ী" অর্থাৎ চৌষট্টি টি পাপড়িযুক্ত বিকশিত যে পদুমা। এছাড়া শবর পাদের একটি পদে পদ্মফুলের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। উঁচু উঁচু পর্বতে, কাপাসফুলে আর চারপাশ ঘেরা দেখে কবি বলেছেন- "ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশফুলিআ।" গেছে। তাছাড়া পাশে চাঁদ উঠেছে - জ্যোৎস্নাবিধৌত কাপাসফুলে পূর্ণ সুশোভিত যে নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র

এখানে ফুটে উঠেছে, তার আলোকে একে সহজেই নিসর্গচেতনামূলক কবিতা বলা যেতে পারে।

ডক্টর [illegible] যে নতুন তেইশটি চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেছেন সেখানে দেখি চর্যাকালের এক সুন্দর চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এ "গিরিবর সিহরেহি বলাকা নাচন্ত" এমনকি চর্যাকালে বাংলার জলস্রোতে সাঁতারের চিত্র আছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া কবিরা সাধনের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও চর্যাপদের মাঝে অনেক স্থানে নিসর্গপ্রকৃতির চিত্র এঁকেছেন চর্যাপদ-কারগণ। এর বিভিন্ন কারণ অনুমান করা যেতে পারে— প্রথমত: মানুষের অনুভূতি সমাজ বহু বাহিত হয়ে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তাই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে চর্যাপদের কবিদের রচনায় পারিপার্শ্বিক নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত: চর্যাপদে বলা হয়েছে এই মায়াময় ও মোহময়ী জগৎ থেকে নির্লিপ্ত থাকতে, তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেই মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করে আলোকে আত্মবিলাসী হিসাবে, যার ফলশ্রুতি বলা হতে পারে। যাইহোক যে কারণেই হোক না কেন চর্যাপদের মাঝে নিসর্গপ্রকৃতির অনেক চিত্র লক্ষ্য করা যায়, আর এই চিত্র সার্থকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

'চিত্রা' কাব্যের গঠনশৈলী / নির্মাণ কৌশল

→ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, — "এই প্রথম কবির সঙ্গে শিল্পী এসে যোগ দিল।" এর পরবর্তীকালে কবি রচনা করলেন 'সোনার তরী' ও তারও পরে 'চিত্রা'। এই 'চিত্রা' কাব্যটি হয়েছে কবির ঐশ্বর্য পর্বের এক অনন্য সৃষ্টি। এখানে দেখা গেল ভাবের সৌন্দর্যের সাথে সাথে রূপের বৈভব। এখানে তিনি একাধারে হয়ে উঠলেন বড় কবি ও বড় শিল্পী। এই কাব্যে নির্মাণ শিল্পের মধ্যে চিত্রকল্প নির্মাণ, ছন্দ সৃষ্টি ও শব্দের উপস্থাপনায় কাব্যের ভাষা সত্যই অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

'চিত্রা' কাব্যের নির্মাণ শিল্পের প্রত্যেক চিত্রকল্পের অনন্য অভিব্যক্তি 'জ্যোৎস্নারাতে', 'সুখ বিজয়িনী', 'উর্বশী' ইত্যাদি বহু কবিতায় যেন এক একটি ছবির রূপায়ন করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা কয়েকটি কবিতার অংশ তুলে ধরতে পারি —

১। চিত্রাকবিতা

"অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুলকাননে।"

এখানে কবিভাবনা যেন জীবনস্রোত ধারা হয়ে চঞ্চল রূপ নিয়েছে। চিত্রাকে কবি যেন নানা বিচিত্রতার মধ্যে দেখেছেন এবং তাকে চিত্ররূপময় করে গড়ে দিয়েছেন। তাই কবি বললেন —

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী।"

এখানে যেন কবির জীবনদেবতা বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ ও দৃশ্য নিয়ে বিচিত্র রূপ ধারন করেছে।

২। উর্বশী

কথার ছবি হল চিত্রকল্প অর্থাৎ যেন শব্দ দিয়ে ছবি তৈরী করা। নন্দন বাসিনী উর্বশীর ছবি তুলে ধরতে গিয়ে কবি চিত্ররূপময় জগৎ গড়ে তুললেন, এঁকে দিলেন একের পর একের ছবি। যেমন —

i) "গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,"
ii) "গৃহ প্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যা দীপখানি।"
iii) "শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।" ইত্যাদি।

এমনই ছবির পর ছবির ঐশ্বর্য আমাদেরকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে দেয় শুধু তাই নয় আমাদের ইন্দ্রিয়লোকের মধ্যে এক স্পর্শ জাগরতা এনে দেয়। যেমন —

i) "নূপুর গুঞ্জরী যাও আকুল অঞ্চলা" (শ্রবন অনুভূতি)

ii) " তোমার অদিষ্ট গন্ধ অন্ধ বায়ু বয়ে চারিভিতে (ঘ্রাণ অনুভব)
iii) " অঙ্গীভূত ত্রিভাসম স্বপ্নছবি ফিরে লুব্ধ চিতে " (স্বাদ অনুভব)

এই দৃষ্টান্ত গুলিতে ইন্দ্রিয় মনস্কতা চিত্রকল্পকে অসামান্য করে তুলেছে।

৩। পুরাণ ও চিত্রকল্প — চিত্রাকাব্যের বেশ কিছু কবিতায় পুরাণ অর্থবহ চিত্র আঁকা হয়েছে যেগুলি কবিতাগুলিকে যেমন অর্থবহ করেছে, তেমনি সেগুলি আমাদেরকে নিয়ে গেছে সুদূর অতীতে। যেমন —

i) " মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল (উর্বশী)
ii) আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।" (উর্বশী)

iii) অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর।" (বিজয়িনী)

লক্ষণীয় যে পুরাণ চিত্র এখানে অনেকটা গল্পের মতো পট পরিবর্তন করেছে।

৪। রূপকথা — পুরাণের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাকাব্যের একাধিক রূপকথারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন — সিন্ধুপারে কবিতায় দেখি —

i) " মাঝখানে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালর গাঁথা
তারই তলে মণি পালঙ্ক পরে অমল শয়ন পাতা।"
ii) "অমনি, রমণী কনক দণ্ড আঘাত করিল ভূমে
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপধূমে।"

ফলে চিত্রাকাব্যের কায়া নির্মাণে চিত্রকল্পই যেন সবচেয়ে বড় প্রধান কলা হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পের বৈভব যেন এই কাব্যের সৌন্দর্যকে গড়ে দিয়েছেন

৫। অলঙ্কার সৃষ্টি — চিত্রাকাব্যের এক বড় সম্পদ হয়েছে অলঙ্কারের বৈভব কবি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অনুপম প্রয়োগের কাব্যের মধ্যে এক দীপ্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন —

i) "অন্ধকারে ডাকে ঝিল্লি, নিরাশশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন," (সমাসোক্তি)

ii) "অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে" (উৎপ্রেক্ষা)

iii) "লুটায়ে মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে," (উৎপ্রেক্ষা)

কবি যেমন এখানে গড়ে দিয়েছেন অলংকারের জগৎ যা 'চিত্রা' কাব্যের গঠনশৈলীকে বৈচিত্র্যময় করে দিয়েছে।

৬। ছন্দসৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' কাব্যের পয়ারের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন আবার এই কাব্যে কলাবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের অনন্য প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করলাম।

i) কলাবৃত্ত

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী"। (চিত্রা)

ii) মিশ্রকলাবৃত্ত

"আবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের
তীরে। হে কল্পনে, রঙ্গময়ী,
দুলায়ো না সমীরে সমীরে।"

'চিত্রা' কাব্যের রবীন্দ্রনাথ একাধারে শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর মর্ত্যপ্রীতি, জগৎ জীবনানুরাগ, প্রেমচেতনা, সৌন্দর্যবোধ, জীবনদেবতা ভাবনা ও জগৎজীবন সম্পর্কে গভীর অনুভূতি। এই বিচিত্র ভাবনার প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বিষয় অনুসারে অনুযায়ী কাব্যের কায়া নির্মাণ করেছেন অনুভূতি ও কল্পনাকে তিনি ছন্দে অলংকারে ও চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায় অসাধারণ ভাবে গড়ে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুবনে 'চিত্রা' কাব্যটি তার নির্মাণ কৌশলের জন্যই অভিনবত্বের দাবি রাখে।

—— X ——

৫৮

২৫। 'চিত্রা' কাব্যের 'নাম' কবিতা আলোচনা কর। ('চিত্রা' কবিতা)

রবীন্দ্রনাথ 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আবির্ভূত নন, ক্রমবিকশিত মথিত, আর্ত এক শিল্পীসত্তা। মর্ত্যমানসীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক সত্তা ও শিল্পী সত্তার বিকাশ ও বিবর্তন। 'মানসী'র প্রেমের বিষাদ ও দ্বন্দ্ব, 'সোনার তরী'র প্রবল আবেগ 'চিত্রা'তে বিশুদ্ধ প্রশান্ত আরতিতে রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য দর্শন পথ খোঁজার পালা শেষ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে 'চিত্রা'র বিচিত্র জগতে। মিলন নয় বিরহ, প্রাপ্তি নয় অপ্রাপ্তি– এটাই সুন্দরের শেষকথা, সেই শেষ কথারই হোমশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে 'চিত্রা' কবিতায়।

'চিত্রা' কবিতাটির জন্ম ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সালে। জ্যোৎস্না প্লাবনের মধ্যে সৌন্দর্য সত্তায় যে 'বিশ্বমোহাবিনী' লক্ষ্মী, 'জ্যোতির্ময়ী বালা' একাকিনী বিরাজমান, যে 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী, অনন্তের অন্তরশায়িনী' তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন:

'আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা;

সেই কবিতাটি সেই বিশ্ববিমোহিনী বিশ্বমোহাবিনী বিশ্বব্যাপিনী ও অনন্তের অন্তরশায়িনী সৌন্দর্য লক্ষ্মীরই বন্দনা। যে অমূর্ত অনাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে, মূর্তির মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছে তাঁরই বন্দনা এই 'চিত্রা' কবিতা।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে য়ুরোপীয় মনীষীদের কথা আমাদের এই কবিতা বুঝতে সাহায্য করবে। সৌন্দর্য হল, —

"The beauty of finite things arises out of their participation in the eternal and ideal arche-types." (Plato).

আবার কান্ট বলেছেন, —

"Beauty is a state of the mind, a satisfaction, which is purely subjective." (Kant)

অর্থাৎ সৌন্দর্য আকার বা form-এর অন্তর্নিহিত একটি বোধ- এই সৌন্দর্য অমূর্ত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে রুচি ও মত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন: কিন্তু সকল রুচি ও মতের বিরোধের মধ্যেও যা সুন্দর বলে গন্য হয় তাই সুন্দর এবং সেই বোধটিই AEsthetic sence, Aesthetic idea. কান্ট বলেছেন, সৌন্দর্য নিরাকার বা অমূর্ত [illegible]

সেই একটা অস্তিত্ব আছে, সত্তা আছে — যা সুন্দর তা চিরকালই সুন্দর — এ প্রসঙ্গে কীট্স বলেছেন, ——

"A thing of beauty is a joy for ever."

সৌন্দর্যের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক থেকেও নাই।

'চিত্রা' কবিতাটি জগৎ লক্ষ্মীর বন্দনা, যে ভূমার পরিচয় কবি অন্তরের নিভৃত কোণে পেয়েছেন, তাকেই তিনি প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত বিচিত্র রূপে দেখতে চান ও দেখতে পান।

সেই কবিতাতে কবি সৌন্দর্যকে বহির্জগতের মধ্যে এক প্রকারে দেখেছেন, এবং অন্তরে ভিন্ন প্রকারে তাকে দর্শন করেছেন বাহিরের সৌন্দর্যকে তিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। বহির্জগতের সৌন্দর্যের রূপ বহু বস্তুর মধ্যে দিয়ে বহু রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে-ফুলে গন্ধে-বর্ণে নানা সঙ্গীতে নানা রসে নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাহিরের সেই বহু বিচিত্র সৌন্দর্যই অন্তরে অভিন্ন একক রূপে প্রতিভাত হয়েছে। বাহিরে যে সৌন্দর্য বিচিত্র বহু বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে সেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড স্থির গম্ভীর।

কবি বিশ্বচেতনা হতে আত্মগত কল্পনায় প্রত্যাবৃত্ত হয়ে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কল্পনাকে তিনি সীমাবদ্ধ করতে চাননি, তাই বিভিন্নভাবে সেই বাস্তবজগতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, তাই কবি বলেন ——

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে-
তুমি বিচিত্ররূপিনী।"

সর্বত্র সেই অন্তরের সৌন্দর্য কল্পনার বিচিত্র রূপ প্রতিভাত তাই তিনি ~~বলেছেন~~ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই বিচিত্র কাব্য-কল্পনা নানাভাবে বাস্তব জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, তাই তিনি বিচিত্ররূপিনী হয়ে কবির কাছে প্রকাশ পাচ্ছেন। তাই কবির লেখনীতে বহির্মুখী রূপের প্রকাশ এইভাবে, ——

"মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্ত বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিনী।"

আবার এই সৌন্দর্য কল্পনাকে কবি বাস্তব জগৎ হতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত করে মনোজগতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বহির্জগৎ হতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত বলে অন্তর্জগতে কোন চঞ্চলতা নেই। আছে কেবল সৌন্দর্যবোধ, প্রীতি, মধুরতা এবং ভাবনিমগ্নতা। তাই কবি বলেন ——

"অন্তরমাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।"

এখানে ভাবোন্মাদনার জন্য বেদনা হয়, তা বস্তুবিক দুঃখ নয়, বিলাস তা সুখেরই আতিশয্য; সেখানে তীব্রতা নেই, আছে তৃপ্তি। আনন্দ বিহ্বলতাই তাঁর শান্তিময়ী কল্পনা মূর্তির পূজার একমাত্র উপকরণ। এখানে অন্তর্মুখী কল্পনাকে বহির্মুখী কল্পনা হতে বড় করেছেন।

যে কাব্যরস অথবা সৌন্দর্যবোধ আমরা জগতের বৈচিত্র্য হতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আহরণ করি, তা সদা চঞ্চল। তাই কবি বলেন,—

"অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।।"

কবি চিত্রশিল্পী এই কল্পনাকে অসংখ্য বিচিত্র রূপে সৃষ্টি করেনও বাহিরে প্রকাশ করেন। এখানে চঞ্চল তার গতি, অশান্ত তার স্বভাব, বিচিত্র তার প্রভাব।

কিন্তু এই বাহিরের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অনুভূতির আনন্দ যখন স্থির শান্ত অচপল রূপ ধারণ করে অন্তরে সুসমাহিত হয় ও অনৈসর্গিক আত্মচেতনার সৃষ্টি করে। তখনই বাহিরের সেই সৌন্দর্য আহরণেরও সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রকৃত সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় ঘটে। তাই কবি বলেন —

"একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে,
চারিদিকে চিরযামিনী।"

সমস্ত চঞ্চলতা চপলতা বিচিত্রতা থেমে গিয়ে একটা 'স্থির শান্তি', একটা 'বিপুল বিরতি' একটা 'অনিমেষ মূরতি' একটা 'মৌন মহিমা'র

রূপায়ন করেছেন: 'অন্তর মাঝে শুধু এক-একাকী'।

অন্তর মাঝে তোমার পরিচয় পাওয়া যায় শুধু নিজের অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার মধ্যে, আপন অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বরূপ সত্তা আছে। কবি তাঁর 'চিত্রা' কবিতায় তাকেই সম্বোধন করেছেন। চিত্রা কাব্যের প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, —

"এই চিত্রাটি যে কে তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার জো নাই। হয়তো অভিধানে সে যায় নাই। সে যে ইনি 'সোনার তরী'র 'মানস-সুন্দরী' কবির হৃদয়ের অন্তর দেবতা।"

বাহিরে যিনি বিচিত্র চঞ্চল, অন্তরে তিনিই এক অচপল, অন্তরের প্রশান্ত একাই বাহিরের বিচিত্ররূপিনী। 'চিত্রা' কাব্যের মূল সুর এই কবিতার মধ্যে নিহিত। তাই এই কবিতাটি কাব্যের মুখ্য বলা যেতে পারে। সেই দিক থেকে কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। সবশেষে এই কবিতা সম্পর্কে কবির কথা দিয়ে শেষ করছি, তা হল :

আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। সেই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানাভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা ~~আপনাকে~~ আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেঁয়ে হলে মানুষকে মনমরা করে।

11.07.2020

মাথুর কাকে বলে? মাথুর ও প্রবাসের মধ্যে পার্থক্য কী? বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের পদ রচনায় বিশিষ্টতাগুলি আলোচনা কর॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারাকে আখ্যান কাব্য এবং গীতিকাব্য এই দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গীতিকাব্য ধারার একটি প্রধান শাখা। এই বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অন্যতম হল মাথুর। 'মাথুর' শব্দটির অর্থ হল মথুরা সংক্রান্ত। কাজেই মাথুর বলতে বোঝায়- প্রথমত: কংসকে হত্যা করার জন্য কৃষ্ণের মথুরা গমন। দ্বিতীয়ত: বৃন্দাবন ত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরা গমনে রাধার মনে যে বিরহ বা দুঃখ বোধ জেগেছিল তাই হল মাথুর। বৈষ্ণব পদাবলী রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অবলম্বন করে লেখা ঈশ্বরের আরতি। কাজেই বলা যায়- বৈষ্ণব পদাবলীতে 'মাথুর' বলতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা নয়, কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতাই বোঝানো হয়েছে।

মাথুরের সাথে প্রবাস-এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। নায়কের অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রবাসে গমনের ফলেই তো বৈষ্ণব-পদাবলীতে মাথুর পর্যায়টি সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাস হল দুই প্রকার- ① নিকট প্রবাস এবং ② দূর প্রবাস। নিকট প্রবাস হল যখন কৃষ্ণ অল্প সময়ের জন্য রাধার কাছ থেকে দূরে আছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁদের মিলন ঘটতে পারে। কিন্তু দূর প্রবাস হল কৃষ্ণ বৃন্দাবনে নেই, দীর্ঘদিনের জন্য দূর দেশে চলে গেছেন, রাধার সাথে কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হতে পারে দীর্ঘদিন পরে। আবার তা নাও হতে পারে। এই দূর প্রবাসই হল মাথুর।

মাথুর ও প্রবাসের মধ্যে পার্থক্য হল- ① মাথুরে কৃষ্ণের মথুরায় গমনকেই বোঝায়। কিন্তু প্রবাস বলতে সবসময় তা বোঝায় না, ② মাথুরে রাধার বিরহ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু প্রবাসে অর্থাৎ নিকট প্রবাসে রাধার এই বিরহ দীর্ঘস্থায়ী নয়, ③ মাথুরে রাধার সাথে কৃষ্ণের মিলন ঘটবে দীর্ঘদিন পরে। কিন্তু প্রবাসে অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণের সাথে রাধার মিলন ঘটতে পারে, ④ মাথুরে রাধার অন্তরের ব্যাকুলতাকে নিবৃত্ত করার উপায় নেই। কিন্তু প্রবাসে রাধার এই চিত্তব্যাকুলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় অনেক সহজসাধ্য।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চতুস্তম্ভের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদকার হলেন বিদ্যাপতি। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রায় সবকটি পর্যায়ের পদ রচনা করলেও, মাথুর পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত – 'চিরচন্দন উরে হার না দেলা।' পদটিতে রাধার বিরহ-তাপিত হৃদয়ের আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের নাম শ্রবণ এক সময় রাধার মনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, তারই পরিণামে কামবহ্নি নির্বাপনের জন্য অভিসারের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয় মিলন। কিন্তু সুখতো নিরবচ্ছিন্ন নয়, সুখ ক্ষণিকের। তাই দুঃখের অশ্রু জলে পরিব্যাপ্ত এই পরম কাম্য সুখমিলন খুব শীঘ্রই পরিণত হয় বিরহের আর্তিতে, বেদনার অশ্রুতে। রাধার ক্ষেত্রে ও তাই ঘটেছে। রাধার এই বেদনা আর্তি ই তো মাথুর। কৃষ্ণের মথুরা গমনে একাকিনী রাধা, তার অন্তরের বিরহ বিষাদকেই তার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর রাধার এই বিরহ বেদনা আমাদের অন্তরের অশ্রুসাগর কে উদ্বেলিত করে, তার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগায়, এটা সম্ভব হয়েছে বৈষ্ণব পদকারদের পদের মধ্যদিয়ে।

বর্তমান পদটিতে বিদ্যাপতি রাধার এইরূপটিই অঙ্কিত করেছেন। কৃষ্ণের বিরহে তাই বিরহিনী রাধিকাকে বলতে শুনি- পাছে মিলনে কোন রকম বাধা সৃষ্টি হয়, সেজন্য তিনি হার পড়েননি, চন্দন মাখেন নি, এমনকি বসন পর্যন্ত তিনি অপ-সারিত করেছেন। সেই কৃষ্ণ আর রাধার কাছ থেকে বহুদূরে, নদী, গিরির দুস্তর ব্যবধান আর উভয়ের মধ্যে। তাই বিদ্যাপতির রাধা বলেছে- "চিরচন্দন উরে হার না দেলা
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।"

শুধু তাই নয় যে কৃষ্ণের মিলন সুখে গরবিনী হয়ে রাধা অন্য কাউকে গ্রাহ্য করেন না, আর এই অহংকারের জন্য, গ্রাহ্য না করার জন্য রাধাকে শুনতে হয়েছে অনেক কটুকথা, আর সেই কৃষ্ণ আজ তার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ায় রাধার বিরহ হয়ে উঠেছে অপরিসীম, এই কারণে তো রাধার মনে হয়েছে, কৃষ্ণ বিহনে তাঁর এই জীবনের কোন প্রয়োজন নেই,

রাধার এই বিরহ বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্যাপতি- অন্য একটি পদে বলেছেন কৃষ্ণের বিরহে রাধার 'কাঁচি যতত ছাড়িয়া,

কিম্বা রাধা যখন বলে উঠে "আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥"

তখন তার বিরহিনী সত্তাটি আমাদের কাছে করুণ ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই যে কৃষ্ণ সর্বস্বতা তার প্রকাশ ঘটেছে আমাদের পাঠ্য পদটিতেও যেখানে দেখি কৃষ্ণের বিরহে রাধার মনে জেগেছে বিরহ বেদনা। আর এই কারণেই রাধার অন্তরের কথাটি প্রকাশ পেয়েছে এই ভাবে- "পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে॥"

কাজেই একদিকে এখানে প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণগত প্রাণা রাধিকার একমাত্র অবলম্বন যে কৃষ্ণ আর সেই কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হেতু মথুরায় চলে যাওয়াকে রাধা বিধাতার প্রতিকূলতার কথাকে নির্দিষ্ট করেছেন, আর এই খানেই রাধা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যখন কৃষ্ণ অন্যের কারণে তাঁকে একা ফেলে রেখে অন্য দেশে চলে গেছেন সেজন্য দোষী কৃষ্ণ নন, তার নিজের কর্মের দোষ বলেই রাধা তাকে নির্দেশ করে বলেছে- "পিয়াক দোষ নাহি যে ছিল করমে," কিন্তু কৃষ্ণ তারই কর্মের দোষে পরদেশে চলে গেলেও তো কৃতকর্মের ফল রাধাকে ভোগ করতেই হচ্ছে। আর এই কারণেই কৃষ্ণ তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার অন্তর শূন্য হয়ে যায়। বিরহের অবসাদ-ময়তা তাকে আচ্ছন্ন করে। আর এই বিরহের তীব্রতাতেই তো রাধার মনে হয়েছে বিরহকে পয়োধি বলে। এই পয়োধি অর্থাৎ সাগর তো সত্যই কূলকিনারাহীন বিরহ সাগর, যার কোন শেষ দেখতে পাচ্ছেন না রাধা, এই বিরহ সাগরের পরপারে আছেন কৃষ্ণ, আর বিচ্ছেদের এই লবণ সমুদ্রের তীরে বসে রাধার হৃদয় তাই হাহাকার করে ওঠে। এই প্রসঙ্গে রাধার বিস্মিত আকুল প্রশ্ন- "বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব।"

বিদ্যাপতি এই ভাবটিকেই অন্য একটি পদে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেখানে দেখি-"সজনি কো কহ আওব মাধাই
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব
* মঝু মনে নাহি পাতিয়াই।"

তখন তো বিচ্ছেদ কাতর এক প্রেমিকার চিত্রটি যেন রাধার মধ্য-দিয়ে রূপ লাভ করে। আবার রাধা যখন কৃষ্ণের সাথে বিরহের

বেদনায় বলে উঠেন- 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর,' তার দুঃখের কোন শেষ নেই তখন, সেই রাধা যেন আমাদের চোখে দেখা চিরচেনা মানবী হয়ে ওঠে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, বিদ্যাপতি বৈষ্ণবপদাবলীর মাথুর পর্যায়ের পদ রচনাতেই অপেক্ষাকৃত বেশি স্বচ্ছন্দ। আর এই ক্ষেত্রে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি ভক্তিভাবকে আশ্রয় করে পদ রচনা করলেও এক্ষেত্রে গীতি কবিতা, মানবিক আবেদন, এবং করুণ রসের সমন্বয় শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভার সংস্পর্শে এসে এক পুষ্পকলি রচনা করেছে। এখানে বিদ্যাপতির সার্থকতা,

---

চিত্রা কাব্যের সিন্ধুপারে কবিতা অবলম্বনে মৃত্যুচিন্তার পরিচয় দাও

→ রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'চিত্রা' কাব্যে। এই কাব্যে সৌন্দর্য বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ক কবিতার কাছাকাছি মৃত্যু সম্পর্কিত কবিতাও রয়েছে। 'সিন্ধুপারে' কবিতাটি একেবারে হয়েছে কবির মৃত্যুর-দর্শন ও জীবনদেবতা তত্ত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ।

'চিত্রা' কাব্যের পূর্ববর্তী 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ একাধিক কবিতায় লক্ষ্য করা গেলেও এখানে কবি সেই জীবন দেবতাকে আরও অন্তরঙ্গতায় উপলব্ধি করেছেন। 'সিন্ধুপারে' কবিতায় কবি জীবনের একটি সমগ্র রূপের কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন, বলা যেতে পারে জীবন-মৃত্যু একটি পূর্ণরূপকে যেন মর্মলোকে গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন যে, প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের এই জীবনে সুখ দুঃখের বিচিত্র সম্বন্ধ। মৃত্যুর রাতে তাই কবির আশঙ্কা হয় যে, সেই সম্বন্ধের বন্ধন ছিন্ন করে কেউ হয়তো সেই প্রাণকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। কবি বলেছেন —

"যে নিজে যার মৃত্যুর ছদ্মবেশে সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী।
পর জীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন
দেখতে পাব চিরপরিচিত মুখশ্রী।"

জীবন ও মৃত্যুর দোলায় রবীন্দ্র চিত্ত প্রথমদিকে সংশয়ের দোলাচলে ছিল তাই তাঁর সংশয়ী মন বারবার বুঝে নিতে চেয়েছে মৃত্যুজীবনের এক বড় ফাঁকি কিনা। পরবর্তীকালে 'বলাকা' কাব্যে কবি এ ব্যাপারে একটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন মৃত্যু জীবনে শুচিস্নান, এ যেন এক পবিত্রতার বীজমন্ত্র —

"তব মৃত্যু মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি মৃত্যুস্নানে
বিশ্বের জীবন।"

'সিন্ধুপারে' কবিতায় এক নাটকীয় ভাবসমৃদ্ধ গল্পকাহিনীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নিজ অন্তরের সংশয়কে অস্তিবাচক প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করেছেন। শীতের নিস্তব্ধ রাত্রি। নির্জন গৃহের সুখশয্যায় গৃহীরা শায়িত। এমন সময়ে বাইরের দ্বারে কবি এক আহ্বান শুনলেন। এক রহস্যময়ী নারীর ইঙ্গিতে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পেছনে ছুটে চলেছেন। পথের দুপাশে কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই রাজপ্রাসাদ শীর্ষে প্রহরের ঘন্টা কেবলই নিনাদিত হচ্ছে। সবপরিবেশের মধ্যে এক অলৌকিক মায়া মমতা অনুভূত হচ্ছে এ যেন কবি কল্পনার মধ্যে এক রোমান্স রসের আবহ নির্মাণের সাধনা কিন্তু কবি দ্রুতগতির জন্যে কোনো কিছুকে সঠিকভাবে অনুভব করতে পারেন নি তখন তাঁর সংশয়দীর্ণ মন প্রশ্ন তোলে —

"দুই ধারে এ কী প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল।"

অথচ কবি যে রমণীর অনুগামী তার মুখ ও অবগুণ্ঠনে ঢাকা অর্থাৎ রহস্যময়। এই রমণী মূর্তির কল্পনার মধ্যে আছে মৃত্যুর শরীরীরূপ (Personification) আর রহস্যময়তা হয়েছে লোকান্তর-প্রয়াণের রূপক। কবি যেন এখানে অপরূপ ও অপরিচিত সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর প্রকৃত রূপের সূচনা দেখতে পাচ্ছেন।

কবির চারপাশে রচিত হয়েছে এক অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশ ফলে —

"ভয়ে ভুলে যায় দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে।
হু হু রবে বায়ু বাজে দুই কানে—ঘোড়া চলে যায় ছুটে।"

ধীরে ধীরে রাত্রিশেষের লগ্ন তৈরি হয়েছে চন্দ্র নেমেছে অস্তাচলে, পূর্বাকাশে সূর্যালোকের প্রথম আলোর চরণধ্বনির আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। পরিব্যাপ্তি পারিপার্শ্বিকেয়তার মধ্যে কবিচেতনাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অশ্বের গতি রুদ্ধ হওয়ায় কবি দেখলেন যে, তিনি এক কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রাসাদ অভ্যন্তরের বর্ণনায় কবি ইংরেজী রোমান্টিক কবিদের প্রাচ্য রূপরসপ্রীতির অনুসরণ করেছেন এর প্রমান মেলে 'কনকশিকলে সোনার প্রদীপ' ভিত্তির গায়ে পাষান মূর্তির প্রভৃতির বর্ণনায়।-

এখানেই শেষ নয়, রমনীর অমোঘ নির্দেশে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি তার পেছনে পেছনে, গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন। গুহার অভ্যন্তরে আছে বিলাসের প্রাচুর্য। কবির কথায় —

"ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ পরে,
কনকশিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে ঘরে ঘরে।
ভিত্তির গায়ে পাষান মূর্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখি, অপরূপ নারী লতাপাতা নানামত।"

রূপকথার দেশের মতো সেখানে মানুষের যা কিছু স্বপ্নের ধন আপনি সজ্জিত হয়ে রয়েছে। সেখানে এক অপূর্ব শয্যায় রমনী এবং তার নির্দেশে কবি ও তার কাছে বসলেন। —

"নীরবে রমনী আবৃত বদনে বসিলা শয্যাপারে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিতে করি পাশে বসাইল মোরে।"

এরপরেই শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল। এমনকি পুরোহিতের আশীর্বাদ নারীবৃন্দের মঙ্গল আচরণ, লৌকিক ব্যাপার ইত্যাদি কোনোকিছু বাদ গেল না। এরপরেই সেই রমনীর সঙ্গে সঙ্গে আবার কবি এসে উপস্থিত হলেন এক সুসজ্জিত ঘরে এর ব্যাখ্যায় কবি বলেছেন —

'কী দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব, হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরনের আলোক সেথায়, নানা বরনের ফুল।
কনকে, রজতে, রতনে জড়িত বসন বিছানো কত,
মনিবেদিকায় কুসুম শয়ন স্বপ্নরচিত মতো।"

এই পরিস্থিতিতে কবি আর নীরব থাকতে পারলেন না। রহস্যময়ীর সঙ্গে তিনি দীর্ঘ পথ পরিভ্রমন করেছেন, জগতকে দেখেছেন, রূপকথার রাজপ্রাসাদও দেখেছেন কিন্তু যাকে তিনি সদ্য বিবাহ করতে বাধ্য হলেন তার মুখ তো এখনো ও দেখা হয়ে ওঠেনি। তাই বলে উঠলেন —

"আমি কহিলাম, 'সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু'।"

রহস্যময়ী নারী এরপর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করল। চারিদিকে বেজে উঠল শত কৌতুক হাসি, শত ফোয়ারার মত। রমনীর অবগুন্ঠন উন্মোচিত হলে দেখা গেল যে, যার পেছনে কবি ভ্রমন সম্পূর্ণ করেছেন, সে আর কেউ নয়, কবির জীবনদেবতা। এবং তাই—

এখানেও তুমি জীবনদেবতা! কহিনু নয়ন জলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসালো, কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।"

আসলে কবি এখানে জীবনদেবতাকে হৃদয়পাত্রে পূর্ণ করে গ্রহন করতে চেয়েছেন। এই জীবনদেবতার সঙ্গে কবির বিচিত্র লীলা তাঁর জীবৎকালে ব্যাপ্ত ছিল। এখানে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়েছে। জীবনের পূর্ণতা এবং মৃত্যু উভয়ের মেলবন্ধনে। মৃত্যু জীবন বিরোধী নয়। মৃত্যুজীবনের পূর্ণতা। এই বিশ্বাস সিন্ধুপারে কবিতায় এক অলৌকিক বাতাবরনে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কবির জীবনদেবতা তাঁর অন্তরের ধন। তাঁর সমস্ত ভালো-মন্দ ও অনুকূল-প্রতিকূল উপকরনকে নিয়ে এই জীবনদেবতা কবির জীবনকে গড়ে দিয়েছে। জন্মজন্মান্তরের ভেতর দিয়ে এই জীবনদেবতা কবির সমগ্র জীবনকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছেন এই বিশ্বাসের যথার্থ কাব্যরূপ এক অলৌকিক আবহ ও নাটকীয় পরিবেশে উপস্থাপিত হয়েছে 'সিন্ধুপারে' কবিতাটিতে। কবির জীবনদেবতা তত্ত্বের এক অনন্য কাব্যফসল হয়েছে 'সিন্ধুপারে'।

— • —

(৬) (৮৫)

৫. রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার চরম ও চূড়ান্ত প্রকাশ 'উর্বশী' কবিতায় রয়েছে। — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

→ রবীন্দ্রনাথ 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আবির্ভূত নন, ক্রমবিকশিত, স্ফুরিত, আর্ত এক শিল্পীসত্তা। মর্ত্য মানবীকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের প্রেমিকসত্তা ও শিল্পীসত্তার বিকাশ ও বিবর্তন। 'মানসী'র প্রেমের দ্বন্দ্ব ও বিষাদ, 'সোনার তরী'র প্রবল আবেগ, 'চিত্রা'তে বিশুদ্ধ প্রশান্ত আকৃতিতে রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রপ্রেম ও সৌন্দর্য দর্শন পক্ষ জোয়ার পালা শেষ করে আত্মার প্রতিষ্ঠার স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছে 'চিত্রা'র বিচিত্র জগতে। মিলন নয়, বিরহ; প্রাপ্তি নয়, অপ্রাপ্তি —— এটাই সুন্দরের শেষ কথা। এই শেষ কথাই প্রতিফলিত হয়েছে 'উর্বশী' কবিতায়।

১৮৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর ভোরে এ কবিতার জন্ম। পৌরাণিক মিথ-এর আশ্রয়ে কবির প্রেম ও সৌন্দর্যদর্শন এখানে সংহত ও সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছে। 'উর্বশী' পৌরাণিক নারী হলেও কবির পরিবেশনা ভঙ্গীর মৌলিকতায় সে হয়েছে ক্লাসিক, আধুনিক রোমান্টিক। বিশ্ব সৌন্দর্যের চূড়ান্ত মূর্তিকে আজ সম্পূর্ণতা দিতে পেরে কবির মানসিক প্রশান্তি দেখা দিয়েছে ——

“উর্বশী নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম”।
[ছিন্নপত্র]

কবি নিজেই তাঁর আলোচ্য কবিতা সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন —

“নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক।”

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

“গেটে যাহাকে বলেন The eternal woman, উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন।”

রবীন্দ্রনাথ নারীর মধ্যে দুটি রূপ দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। একটি কল্যাণী মাতৃমূর্তি, অন্যটি উর্বশী প্রিয়া মূর্তি। এ কবিতা দ্বিতীয় নারীর বন্দনাগান। উর্বশী সর্ববন্ধন মুক্ত, সর্বকামনা মুক্ত, উদাসীন সৌন্দর্যময়ী নারী। এ নারী অমানবী, অপ্রাকৃত, এই 'unexpressive she'-কে কোনো সম্পর্কে বাঁধা যায় না ——

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

'উর্বশী' কবিতায় প্রেমের অনন্ত আর্তি ধ্বনিত, তাই 'উর্বশী' নিখিল বিরহীর ব্যাকুলতা। এ প্রেম দেহাসক্ত রতি নয়, দেহাতীত বিশুদ্ধ আরতি। উর্বশীর প্রেমে রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিরহবোধ। এই বিরহে ব্যক্তিপ্রিয়া লীন হয়ে যায় বিশ্বপ্রিয়াতে, এই প্রিয়াকে মর্ত্যের বাসনা মুষ্ঠিতে ধরা যায় না, সে পলাতকা। তার প্রতি তাই যুগান্তর ব্যাকুলতা —

"যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী।"

সারা বিশ্বের কামনাময় প্রেম তাতে উৎসর্গীকৃত, এই উর্বশীর প্রতি একদিকে মর্ত্যজীবনের ব্যাকুলতা, অন্যদিকে অমর্ত্য জীবনের অসীমতা। রবীন্দ্র-প্রেমে বিরহ মূল সুর। এই সুর মানসীর 'ক্ষণিক মিলন', 'বিরহানন্দ', 'মেঘদূত' ও 'মানস সুন্দরী'-র সপ্তম তান বেজেছে 'উর্বশী'তে।

এ কবিতায় সৌন্দর্যের সুতীব্র, অথচ নির্মল অনুভূতি ব্যক্ত। এই সৌন্দর্য প্রয়োজনাতিরিক্ত, এই সৌন্দর্যবোধি ক্রমবিকশিত। তিনি পৃথিবীর সঙ্গে জন্মান্তরীন সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। নিবিড় নিসর্গ লগ্নতা ও গভীর মর্ত্যানুরাগ কবির সৌন্দর্য চেতনার অন্যতম উপাদান, যা 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার হাত ধরে চরমতা পেয়েছে 'উর্বশী'তে। উর্বশীর সৌন্দর্য বিমূর্ত, অধরা।

বিশ্ব সৌন্দর্যের আরভূতা এই দেবী, তাই—

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লাসি
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।"

'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় নগ্ন, অথচ মোহনসুন্দর সৌন্দর্য-বন্দনা পাই—

'অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন।'

এই সৌন্দর্য আরো সমুন্নত রূপ পেয়েছে 'উর্বশী'তে—

'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।'

এই সৌন্দর্যকে পাওয়ার জন্যই বিশ্বপ্রাণ ক্রন্দসী—

"ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশী!"

উর্বশীর সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করা যায়, উপভোগ করা যায় না। শেলীর 'Hymn to Intellectual Beauty'—তে যে Platonic Love রয়েছে কিংবা কীটসের 'Beauty is truth, truth is beauty'—তে যে সত্য, শিব আর সুন্দরের সমন্বয় রয়েছে — তারই প্রকাশ 'উর্বশী' কবিতা।

গোটা 'চিত্রা' কাব্যে, শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের চরম ও চূড়ান্ত প্রকাশ 'উর্বশী'তে। আলোচ্য কাব্যের 'আবেদন', 'চিত্রা', 'জ্যোৎস্নারাত্রে', 'বিজয়িনী', 'পূর্ণিমা' সমস্ত প্রেমসৌন্দর্য বিষয়ক কবিতাকে ছাপিয়ে উঠেছে 'উর্বশী' কবিতা। সমালোচক অজিত চক্রবর্তী বলেছেন—

"বাস্তবিক উর্বশীর ন্যায় সৌন্দর্যবোধের
এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয়
সাহিত্যে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।"

রবীন্দ্রজীবনীকার টমসন সাহেবও একই সুরে সুর মিলিয়েছেন—

"Urbasi is Perhaps the greatest lyric in all Bengali literature and Probably the most unalloyed and Perfect worship of beauty, which the world's literature contains."

প্রেম ও সৌন্দর্যের এই চরম মূর্তিকে না পেয়ে মানুষের অন্তবিহীন আশা হাহাকার করে—

"ফিরিবে না, ফিরিবে না — অস্তে গেছে সে গৌরবশশী
অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।"

রোমান্টিকের নস্টালজিয়া এই সৌন্দর্য স্বর্গের জন্যই, তাই উদ্বেল হয়ে ওঠে বিরহ—

"সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।"

তবুও অবুঝ মন আমার খেলাঘর গড়ে বেদনার বালুচরে—

"তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে —
অয়ি অবন্ধনে।"

এ আকাঙ্ক্ষাই রোমান্টিকের উপজীব্য, এ আর্তি কেবল এ যুগের রবীন্দ্রনাথের নয়, আগামী রবীন্দ্রনাথেরও। কারণ, এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিতে প্রেমের মৃত্যু।